চারণ সিরিজ ৬

সাম্যবাদের মর্ম্মকথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সাম্যবাদের মর্ম্মকথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক

রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী

নবজীবন পাবলিশিং হাউস

১৯৫।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩৪৫, আষাঢ়

মূল্য—আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীযামিনী মোহন ঘো

পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৪৭, মধু রায় লেন, কলিকাতা

চারণ গোপীনাথ মজুমদারের
করকমলে।

ভূমিকা

সাম্যবাদের মর্ম্মকথা প্রকাশিত হোলো। সাম্যবাদী মানুষকে বলে, তুমি আর আমি। তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ। ক্যাপিট্যালিস্টের কথা এর উল্টো। সে বলে, হয় তুমি—নয় আমি। বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী—ক্যাপিট্যালিস্টের কণ্ঠে এই বিরোধের কোলাহল।

সাম্যবাদের আদর্শ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে অল্পই। কমিউনিস্ট্, সোস্যালিস্ট্, গান্ধীস্ট্— সবাই চান পৃথিবীর সব মানুষকে সুখী করতে। শুধু তাই নয়। বর্ত্তমান রাষ্ট্র এবং সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত সবাইকে সুখী করা যে অসম্ভব—এবিষয়েও গান্ধীবাদী, কমিউনিস্ট আর সোস্যালিস্ট সবাই একমত। Men who are profoundly good without being intelligent have often attained to sainthood. মুষ্টিমেয় মানুষের উৎকট ক্ষমতা-প্রিয়তা আর উদ্দাম অর্থ-লালসা বহু মানুষের অজ্ঞতার আর ভীরুতার সুযোগ নিয়ে যে সমাজ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে চায় মহাকালের বুকে—তার পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টা না ক'রে যাঁরা পরোপকারে ব্রতী হন, তাঁরা সাধু হ'তে পারেন কিন্তু বুদ্ধিমান নন একেবারেই।

গান্ধী সাধু এবং জ্ঞানী—দুইই। এই জন্যই সবরমতীর সন্ন্যাসীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই এমন একটা প্রচণ্ড কর্ম্ম-সাধনা যা বর্ত্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নিরন্নের স্বরাজ।

মতের সঙ্গে মতের পার্থক্য আদর্শ নিয়ে ততখানি নয় যতখানি পন্থা নিয়ে। কমিউনিস্টরা বলে, সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অসম্ভব। আমরা বলি, শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন গুপ্তচরবাহিনী এবং বৈজ্ঞানিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পুলিসবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত রাষ্ট্রশক্তিকে নিরস্ত্র জনসাধারণ হিংসার পথে পঙ্গু করতে পারবে---এমন বিশ্বাস আমাদের নেই।

আইন-সভার মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে মুক্তি আসবে ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে--এমন কথাও আমরা বিশ্বাস করিনে। স্বাধীনতা যখন আসে, মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে নব-জন্মের আবির্ভাবের মতই সহসা সে আসে। স্বাধীনতার অভিধানে 'ক্রমশঃ' ব'লে কোনো শব্দ নেই।

তবে আমরা কোন্ পন্থায় বিশ্বাস করি? আমরা বিশ্বাস করি গান্ধীজীর পন্থায়। The only methods by which a people can protect itself against the tyranny of rulers possessing a modern police force are the non-violent methods of massive non-co-peration and civil disobedience—হাক্সলির এই দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ মিল আছে।

স্বাধীনতার পথ শৌর্য্যের পথ—কেবল এই কথা ব'লেই আমরা ক্ষান্ত থাকিতে চাইনে। সেই শৌর্য্য কোন পথে প্রকাশ পেলে মুক্তির প্রভাত নিকটতর হবে--সে কথাও অকুণ্ঠচিত্তে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করবার দিন এসেছে আজ।

শেষ কথা হোলো Personalityর কথা। সমাজে আর রাষ্ট্রে বিপুল পরিবর্ত্তন ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্ভব। অনাসক্ত (non-attached) মানুষ যখন দলে দলে আসবে সাহস আর স্বাস্থ্য, প্রেম আর জ্ঞান নিয়ে—তখনই আসবে ইতিহাসে যুগান্তর। চারণের সাধনা ইতিহাসে এই যুগান্তর ঘটানোর সাধনা।

কলিকাতা।

১৬ই জুন, ১৯৩৮ সন।

বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়

দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা; দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্দ্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণ-বিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল; সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জ্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা।

রবীন্দ্র নাথ—

Tyranny cannot exist unless there is passive obedience on the part of the tyrannised.

Aldous Huxley.

(১)

যে দিকে তাকাই সেই দিকেই চোখে পড়ে দুঃখের .সমুদ্র। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী নর-নারীর না আছে ঘরে ভাত, না আছে চালে খড়, না আছে পরিধানে শীত নিবারণের বস্ত্র। ভারতবর্ষের সাতলক্ষ গ্রামে যারা বাস করে, তারা তো এক একটী জীবন্ত নর-কঙ্কাল। সংসারে তাদের নিজের বলতে আছে কেবল ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যা আর শীর্ণ বাহু। পেট ভ'রে খাওয়া কাকে বলে, তারা তা জানে না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছি আর দেখেছি কেবল শ্মশানের পর শ্মশান। জলাশয়গুলি কচুরিপানায় ভ'রে আছে। বাঁশ-বনের মধ্যে আর আম-বনের মধ্যে এক একটী জীর্ণ কুটীর। কুটীরের সামনে একটী ঢেঁকী, আম-কাঁঠালের দু-একটী গাছ, কয়েকটী ছাগল ও মুরগী, কতকগুলি উলঙ্গ শিশু আর ধান সিদ্ধ করবার জন্য একটী উনুন। কোনো কোনো কুটীরের অঙ্গনে ধানের গোলা আছে কিন্তু তার মধ্যে ধান নেই, মাটির দেওয়ালে হেলানো লাঙল আছে কিন্তু চাষ করতে হলে যে জমির প্রয়োজন গৃহস্বামীর সেই জমি নেই, শীর্ণ একটী বলদ আছে কিন্তু তার কোন কাজ নেই। কুটীরের আঙিনা ছেড়ে দাওয়ায়

উঠলে দেখা যাবে—একদিকে ঝুলছে একটা মলিন কাঁথা, আর একদিকে ঝুলছে একটা থেলো হুঁকো। দাওয়া ছেড়ে কুটীরের ভিতরে ঢুকলেও চোখে পড়বে সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যের একই ছবি। তৈজসপত্রের মধ্যে দু-চারিটী মাটির হাঁড়ি-কলসী আর বড়ো জোর একটা কাঁসার বাটী ছাড়া ঘরে আর কিছু পাওয়া যাবে না। এই দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে যারা বাস করে, তাদের দুর্ভাগ্যের সত্য সত্যই কোনো অন্ত নেই। জীবন তাদের কাছে একটা নিরবচ্ছিন্ন অভিশাপ, দুশ্চিন্তা তাদের দিবারাত্রির সাথী। অথচ যারা বংশপরম্পরায় বহন ক'রে চলেছে এই দৈন্যের দুর্ব্বহ বোঝা, তারা কিন্তু জীবনে অবসর পায় না এক তিলও। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত একইভাবে ঘুরছে তাদের কাজের চাকা। হাড়-ভাঙা পরিশ্রম ক'রে মাঠে মাঠে ফসল ফলায় তারা; তারা গড়ছে ইমারত, তারা খুঁড়ছে খনি, তারাই কারখানায় কারখানায় তৈরী করছে ছোট আলপিন থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঞ্জিন পর্য্যন্ত সব-কিছু।

সমাজের এই লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারার প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফল কিন্তু ভোগ করছে মুষ্টিমেয় 'পি-পু-ফি-সু'র দল যারা জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য কোন রকম কায়িক পরিশ্রম করতে একান্ত নারাজ। শারীরিক মেহনৎ তাদের কাছে এমনই ঘৃণ্য

সাম্যবাদের মর্ম্মকথা

যে দিনের আলোয় হাতে একটা ছোট পুঁটুলি বইতেও তারা ভয় পায়—পাছে লোকে দেখে ফেলে। এই অলসের দল কোন পরিশ্রম না ক'রেও অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের মালিক, আর এদেরই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য কোটা কোটা নিরন্ন মানুষ আজীবন হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটতে বাধ্য হচ্ছে।

এই যে জগৎ যেখানে একদিকে অসংখ্য মানুষের অন্তহীন দারিদ্র্য এবং আর এক দিকে মুষ্টিমেয় মানুষের ঐশ্বর্য্যের সমারোহ—এই কুৎসিৎ জগৎকে আমরা কোনরকমেই মেনে নিতে পারিনে। আমরা সৃষ্টি করতে চাই একটা নূতনতর জগৎ যেখানে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে আসবে পূর্ণতা আর মুক্তি। আমাদের লক্ষ্য সকল মানুষের মঙ্গল। আমরা এমন একটা অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা আনতে চাই পৃথিবীতে যেখানে ধনী আর দরিদ্র ব'লে দুটী পৃথক শ্রেণী থাকবে না, যেখানে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যের অধিকারী হবে সবাই আর সবাই পাবে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা শিক্ষার আর সংস্কৃতির উপরে সকলের অধিকারকে করবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই নূতন সমাজে প্রত্যেকটী সুস্থকায় নরনারী আপন আপন সামর্থ্য-অনুযায়ী কাজ করবে সমাজের মঙ্গলের জন্য, নিজের সার্থসিদ্ধির জন্য কেউ কাউকে ব্যবহার করতে পারবে না নামমাত্র মজুরি দিয়ে। খাটতে যারা

অক্ষম তাদের ভরণপোষণের ভার নেবে সমাজ। এই অভিনব সমাজে কাজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে যে, চৌর্য্যের অপরাধে অপরাধী ব'লে পরিগণিত হবে সে। চোর তো সেই যে কাজের বেলায় ফাঁকি দেয়, কিন্তু আর দশজনের কাজের দ্বারা যে সম্পদ উৎপন্ন হয় তার উপরে ভাগ বসাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করেনা। সমাজ তখনই প্রত্যেকটী মানুষকে উৎপন্ন সম্পদের ভাগ দিতে পারে যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের মঙ্গলের জন্য কিছু-না-কিছু কাজ করে। এই যে কাজের দায়িত্ব—একে তো আমরা কোন রকমেই অস্বীকার করতে পারিনে। আমরা যে মুহূর্ত্তে পৃথিবীর বুকে আমাদের জীবন-যাত্রা স্বরু করেছি, সেই মুহূর্ত্তেই সমাজের কাছে আমরা ঋণপাশে বাঁধা পড়েছি। চাষী আমার মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে; তন্তুবায় আমার লজ্জা নিবারণ করেছে; শিক্ষক আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত ক'রে তুলেছে। তাদের সেবা না পেলে আমি এতদিন থাকতাম কোথায়? সমাজের কাছে এই যে ঋণের বোঝা, এই বোঝা থেকে কেউ মুক্ত নয়। তাই তো আমাদের সবাইকে জীবনের অপরিহার্য্য ধর্ম্মকার্য্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে সমাজের সেবাকে। সে সেবা বুদ্ধির দ্বারাও হতে পারে, বাহুর দ্বারাও হতে পারে। The duty of work is thus

universal and inescapable. মার্ক্সের ভাষায় এই অভিনব সমাজের নাম Classless Society.

এমনি একটা আদর্শ-সমাজের জয়গান উৎসারিত হোলো কতদেশের কত কবির কণ্ঠ থেকে। কত বীর হাসিমুখে তার বুকের রক্ত দিলো এমনি একটা অনিন্দ্যসুন্দর ভাবী সমাজকে গড়ে তুলবার জন্য। আজিও জগৎ জুড়ে বিপুল সাধনা চলেছে সেই নূতন সমাজ-ব্যবস্থাকে সৃষ্টি করবার জন্য যেখানে মানুষের সর্ব্বাঙ্গ থেকে খসে পড়েছে শৃঙ্খল-ভার, যেখানকার সর্ব্বব্যাপী আনন্দকে কল্পনা ক'রে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে কবি গাইলেন,—

A reborn race appears—a perfect world, all joy!
Women and men in wisdom, innocence and health—all joy!
Riotous laughing bacchanals filled with joy!
War, sorrow, suffering gone—the rank earth purged—
nothing but joy left!

---

(২)

ভাবী জগতের এই যে সুন্দর কল্পনা—এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে হ'লে সকলের আগে দৈন্যকে রূপান্তরিত করতে হবে প্রাচুর্য্যে। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না—এটা কেবল কথার কথা নয়। মানুষ যতক্ষণ ক্ষুধার যাতনায় কষ্ট পায় ততক্ষণ পৃথিবীতে তার একমাত্র কাম্য হচ্ছে অন্ন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেকটী মানুষের জন্য চাই অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়। তাকে বাঁচতে হবে সকলের আগে। বাঁচার সমস্যার সমাধান হ'লে তখন আসবে মানুষকে রাজনীতির এবং বিজ্ঞানের, আর্টের এবং ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার সমস্যা। সভ্যতার বিস্তার নির্ভর করছে দারিদ্র্যের অবসানের উপর। সম্পদের প্রাচুর্য্যের উপরে যতক্ষণ প্রত্যেকটী নরনারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ আর্ট এবং বিজ্ঞান, ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি ইত্যাদি বড় বড় কথা উচ্চারণ না করাই ভালো। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সর্ব্বজনীন মঙ্গলের আদর্শের কথা বলেছি সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে অর্থাৎ সমাজের প্রতেকটী মানুষকে স্বাস্থ্যের এবং সম্পদের, শিক্ষার এবং সংস্কৃতির অধিকারী করতে হ'লে আগে তাকে মুক্ত করতে

হবে দৈন্যের অভিশাপ থেকে। যে মানুষ শীতে থরো থরো ক'রে কাঁপছে, তাকে বেদান্ত শোনাতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যার সামনে উপবাসী স্ত্রী-পুত্রের ম্লান মুখচ্ছবি, তার কাছে ভাতের থালা রবীন্দ্রনাথের ছন্দের মালার চেয়ে অনেক মূল্যবান। কাল কি খাবো—এই দুশ্চিন্তাই হ'চ্ছে মানুষের আত্ম-প্রকাশের পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। I must be safe-guarded against the wants of to-morrow. I must know that I can build a home, and make that home a means of self-expression. দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে যদি মুক্তি না পাই, মনুষ্যত্বের স্ফুরণ অসম্ভব। দৈন্যের শৃঙ্খলে যারা শৃঙ্খলিত, তারাই হচ্ছে আসল দুর্ভাগা। তারা শুধু পরিপুষ্ট করে সেই মনুষ্যনামধারী হতভাগ্যের দলকে (half-souls) যাদের আমরা দেখতে পাই বস্তিতে আর জেলখানায়।

সুতরাং বর্ব্বরতার অন্ধকার থেকে দেশকে সভ্যতার অরুণালোকে টেনে তুলবার জন্য আমাদের প্রথম প্রয়োজন সম্পদের প্রাচুর্য্য। প্রাচুর্য্যকে ক'রতে হবে আমাদের জপমন্ত্র। মাঠে মাঠে ফলাতে হবে প্রচুর ফসল যাতে কোনো মানুষের অন্নের অভাব না ঘটে। কারখানায় কারখানায় তৈরী করা চাই প্রচুর দ্রব্য-সামগ্রী যাতে দৈন্যের পীড়ন কোন মানুষকে সহ্য করতে না হয়। সভ্য-জীবন-যাপনের প্রথম ভিত্তি হ'চ্ছে প্রাচুর্য্যের মধ্যে দৈন্যের অবসান।

আর এই যে সম্পদের প্রাচুর্য্য—এই প্রাচুর্য্যে এসে আমাদের যাত্রা থেমে গেলে কিন্তু চলবে না। প্রাচুর্য্য চাই সকলের জন্য, for the whole population. জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই অধিকার থাকবে এই সম্পদের প্রাচুর্য্যের উপরে। ব্রাহ্মণ হোক আর অব্রাহ্মণ হোক, পণ্ডিত হোক আর মূর্খ হোক, হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক—কেউ থাকবেনা দীন-দরিদ্র; আত্মপ্রকাশের পথকে প্রশস্ত করবার জন্য ঘর-বাড়ী, অন্ন-বস্ত্র যা-কিছুর প্রয়োজন—সব-কিছুর উপরে থাকবে তার দাবী। এই যে universalism in plenty অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের উপরে সব মানুষের সমান অধিকার—এই আইডিয়াকে যতক্ষণ আমরা সত্য ক'রে তুলতে না পারছিত তক্ষণ সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সর্ব্বজনীন করবার কোনো আশাই নেই।

এইখানেই আসে ধনতন্ত্রের অবসানের কথা। ধনতন্ত্র বলতে এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায়—যেখানে জমি-জমা, কল-কারখানা আর খনিগুলির অধিকারী কয়েকজন ব্যক্তি-বিশেষ অথবা ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি।

By this word capitalism we mean an economic system under which the fields, factories and mines are owned by individuals and groups of individuals.

ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে প্রাচুর্য্যের উপরে সকল

মানুষের অধিকার অসম্ভব। তার কারণ হ'চ্ছে—ধনোৎপাদনের উপায়গুলির যারা এখন মালিক, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হ'চ্ছে কাঞ্চন। লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতে প্রয়োজন আছে—সে দিকে তাদের কোনো দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি কেবল টাকার পানে। তারা যদি হাজার হাজার মানুষের ভাত-কাপড়ের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে জমি, খনি আর কলকারখানা গুলিকে ব্যবহার করতো তবে পৃথিবী আজ নরকের সামিল হ'য়ে থাকতো না—প্রাচুর্য্যের মাঝে দৈন্যের অবসান ঘটতো এত দিনে।

কিন্তু টাকা যাদের জীবনের ধ্রুবতারা তাদের কাছে মানুষের দাম কাণাকড়িও নয়। মানুষ তাদের কাছে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রমাত্র। জমির, খনির আর কলকারখানার মালিক যারা, তারা আজ সারা-পৃথিবী জুড়ে মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে ছিনিমিনি। ধনোৎপাদনের উপায়গুলির উপরে তাদের ষোলোআনা অধিকার না থাকলে অসংখ্য মানুষের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা কখনই সম্ভব হোতো না।

একজন জমিদার যেখানে বিশাল জমির ষোলআনা মালিক সেখানে—যে মানুষগুলি তার জমিতে বাস করে—তাদের জীবন কত যে অসহায়, সেকথা অজানা নেই কারও। জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক—টাকার সম্পর্ক ছাড়া আর

কিছুই নয়। জমিতে প্রজার অস্তিত্ব যতক্ষণ জমিদারের স্বার্থের অনুকূল, ততক্ষণই সেখানে থাকে তার বাস করিবার অধিকার। তার অস্তিত্ব যখনই ভূস্বামীর স্বার্থের প্রতিকূল হ'য়ে দাঁড়ায় তখনই তার বাসা ভেঙে যায় ঝোড়ো হাওয়ায় উৎক্ষিপ্ত বাবুই পাখীর বাসার মত।

কলের মালিক কারখানায় কাজ করবার জন্য ডাকে মজুরদের। সর্ব্বহারা শ্রমিকের দল সেই ডাকে দলে দলে আসে কারখানায় কাজ করতে আর বংশবৃদ্ধি করে খরগোসের মত। কিন্তু যন্ত্রের আবির্ভাব যতবেশী ঘটে, মানুষের প্রয়োজন ততবেশী হ্রাস পায়। অবশেষে শ্রমিকদের জীবনে আসে সেই দুর্দ্দিনের রাত্রি—যখন মালিকেরা তাদের ডেকে শুনিয়ে দেয়—তোমাদের আর প্রয়োজন নেই। জমিদার যাদের তাড়িয়েছে জমি থেকে, তারা হয়ত পেয়েছিল কারখানায় আশ্রয়। সে আশ্রয়ও যখন ভাঙে তখন দুর্ভাগার দলের অনেকে অনাহারের হাত এড়াবার জন্য পাপের পথে যেতে বাধ্য হয়। পুরুষেরা গায়ে ইউনিফর্ম্ম চড়িয়ে পেটের দায়ে হয় সেপাই আর কুচকাওয়াজ শেখে তাদেরই রক্ষা করবার জন্য যারা তাদের ভক্ষক। মেয়েরা গায়ে গিল্টির গয়না প'রে নাম লেখায় বারবনিতার দলে আর ঐশ্বর্য্যশালী লম্পটদের কামানলে যোগায় ইন্ধন।

সাম্যবাদের মর্ম্মকথা

এতক্ষণ যা বলা হোলো তার তাৎপর্য্য আমরা যদি ভালো ক'রে বুঝে থাকি—তবে একটা সত্য আমাদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। এই সত্যটি হোলো সহস্র সহস্র মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত আর কলঙ্কিত করতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত এমন বস্তু আর নেই। জমি, খনি আর কলকারখানার উপরে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার যতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকবে ততক্ষণ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে মুক্তির আনন্দ থেকে যাবে অনাস্বাদিত। তারা বংশপরম্পরায় আজীবন উদয়াস্ত খেটে যাবে—কিন্তু প্রাচুর্য্যের মাঝে তাদের দৈন্য কোনোদিন রূপান্তরিত হবে না।

এইজন্যই পৃথিবীর যাঁরা শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর তাঁরা ব'লে থাকেন Expropriationএর কথা। যারা ধনী, তারা তো ইচ্ছা ক'রে তাদের অন্যায় অধিকারকে ছেড়ে দেবে না। স্বেচ্ছায় স্বার্থকে ত্যাগ করা মানুষের স্বভাব নয়। ইতিহাসও আমাদের এই কথা শেখায়। মানুষ স্বেচ্ছায় যদি তার স্বার্থকে ত্যাগ করতে পারতো, বারে বারে বিপ্লব দেখা দিতো না মানুষের ইতিহাসে। বিপ্লব আসে কখন? লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা দারিদ্র্যের দুঃসহ দুঃখকে আর সহ্য করতে পারেনা যখন। দৈন্যের যাতনাকে দীর্ঘকাল ধ'রে সহ্য করতে করতে এমন একটা অবস্থায় এসে মানুষ পৌঁছায় যখন সে মুক্তির জন্য মরিয়া হ'য়ে ওঠে। এই

মরিয়া ভাবটা যখন হাজার হাজার মানুষের অন্তরে বাসা বাঁধে তখনই ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সুরু হয় নটরাজের প্রলয় নাচন। বৈষম্যের উদ্ধত দুর্গপ্রাকার ধূলোয় পড়ে লুটিয়ে—ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হয় বিলুপ্ত—দিগন্তে দেখা দেয় সাম্যের অরুণজ্যোতি—ইতিহাসে আবির্ভূত হয় নবযুগ! Yet the State remains divided into rich and poor; and men, after a period, refuse to suffer quietly. Then revolution supervenes to alter the 'balance in the State. * যারা এখন জমি, খনি আর কল-কারখানার মালিক তাদের কাছে সমাজের মঙ্গলের কোন মূল্য নেই; তারা চায় কেবল টাকা আর টাকা। তাই সর্ব্বহারার দল যা চায় তা কখনও আবেদন আর নিবেদনের দ্বারা তারা পাবে না। সম্পত্তির যারা মালিক তাদের কাছ থেকে অধিকার আদায় ক'রে নিতে হবে; for voluntary abdication from special privilege has been the exception, and not the rule, in history. † বিশেষ অধিকার স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করেছে—এমন নজির ইতিহাসে বিরল। যাঁদের মুখ দিয়ে Expropriation-এর কথা বেরিয়েছে—তাঁরা ধনীদের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হ'য়ে এমন কথা বলেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটা

* A Gramar of Politics by Harold. J. Laski. P. 177

† A Grammar of Politics—By Harhold J. Laski. P.150

মানব-সমাজকে সৃষ্টি করতে যার ভিত্তি হবে সাম্যের উপরে আর ন্যায়ের উপরে। সমাজে ধনী সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকতে এমন একটা আদর্শ-সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব। আর তাদের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে হ'লে Expropriation অপরিহার্য্য।

Expropriation-এর প্রয়োজন মার্কস এবং ক্রোপটকিন যেমন স্বীকার করেছেন, গান্ধীজীও তেমনি স্বীকার করেছেন। স্বীকার না ক'রে যে উপায় নেই। যারা বর্ত্তমান জগতের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় নিজেদের সুবিধার ও স্বার্থের জন্য তারা অবশ্য Expropriationএর কথা শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। কিন্তু সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা চলতি জগতের অন্যায় আর অবিচারের ঔদ্ধত্যকে ভেঙে একটা নূতনতর জগত সৃষ্টি করতে চান—যেখানে সবাই হবে সুখী। এঁদের কল্পনায় ভাবী মানুষের নূতন জ্যোতির্ম্ময় রূপ। সেই মানুষ ক্ষুধার যাতনা থেকে পেয়েছে মুক্তি—সেই মানুষের নগ্নতা বিলুপ্ত হয়েছে বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের মধ্যে। মার্কস থেকে গান্ধী পর্য্যন্ত সকলেরই কল্পনাকে অধিকার করেছে এমন একটা অভিনব সমাজের রূপ যেখানে একটি মানুষেরও জীবনে দারিদ্র্যের অভিশাপ নেই।

If you will follow what I have been saying all these

twenty years, you will understand that what I aim at is food and clothing in plenty in every house. I am visualising a state where there would be none naked and starving.

এই কথাগুলি হোলো গান্ধীজীর কথা, কেবল গান্ধীজীর কথা কেন—মানুষের মঙ্গল যাঁদের জীবনের ধ্রুবতারা তাঁদের সকলেরই এই কথা। তাঁদের সকলের মনেই অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের চিন্তা। একটি গৃহ নয়, দুটি গৃহ নয়, প্রত্যেকটি গৃহ ভরে উঠবে অন্ন-প্রাচুর্য্যে—এই কল্পনা ছাড়া আর কোন কল্পনা নেই তাঁদের মনে। কেন নেই? কারণ আগে মানুষকে বাঁচাতে হবে অন্ন দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে। ধর্ম্মের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, সংস্কৃতির সমস্যা, আর্টের সমস্যা—সব সমস্যার স্থান হলো বাঁচার সমস্যার পরে।

এই যে প্রত্যেকটি গৃহে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য্যের কল্পনা—গান্ধীজীর এ কল্পনা ততদিন বাস্তবে পরিণত হবে না—যত দিন না সমস্ত জমি, সমস্ত খনি আর সমস্ত কলকারখানার উপরে সমাজের সর্ব্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় মানুষ বংশ-পরম্পরায় যে অধিকার ভোগ ক'রে আসছে—সেই অধিকারকে সহজে তারা ছেড়ে দেবে, এমন মনে করবার কোনোই কারণ নেই। আমরা বাইরে সভ্যতার

যতই ভান করি না কেন, ভিতরে আমরা এখনও আছি বর্ব্বর আর বর্ব্বর ব'লেই দশের মঙ্গলের দিকে চেয়ে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করতে আমরা এত নারাজ। মানুষ স্বেচ্ছায় তার স্বার্থকে ত্যাগ করতে নারাজ ব'লেই তো ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে সুরু হ'য়ে গেছে জগদ্ব্যাপী অভিযান। সোভিয়েট রাশিয়ায় অবস্থাসম্পন্ন চাষী-গৃহস্থকে (kulak) তার জমি থেকে সরিয়ে সেই জমিকে সাধারণের জমির সঙ্গে যুক্ত করার যে আন্দোলন চলেছে, সে আন্দোলন এইজ গদ্ব্যাপী অভিযানেরই একটা অঙ্গ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে এই অভিযানের সুরই কি আমরা শুনতে পেলাম না হরিপুরায় জাতীয় মহাসম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে ?

Regarding reconstruction our principal problem will be how to eradicate poverty from our country. That will require a radical reform of our land-system including the abolition of landlordism.

সুভাষচন্দ্রের এই জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে ষ্ট্যালিনের Collectivisationএর মন্ত্র কি এক সুরে বাঁধা নয় ? আধুনিক যা কিছু প্রগতিমূলক আন্দোলন—তাদের সকলের মধ্যেই শুনতে পাওয়া যাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে এই আক্রমণের সুর। বার্ণার্ড শ'এর ভাষায়—

সাম্যবাদের মর্ম্মকথা

All modern progressive and revolutionary movements are at bottom attacks on private property.

এ আক্রমণের মধ্যে যারা আবিষ্কার করে ধনীদের প্রতি দরিদ্রের ঈর্ষা, তারা সত্যেরই অমর্য্যাদা করে। চিন্তাশীল মানুষ দেখেছে—সম্পত্তির উপরে ব্যক্তিগত অধিকার যতদিন অবাধ থাকবে, ততদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে না আর মুষ্টিমেয় মানুষ কোন মেহনৎ না করেও বিলাসের স্রোতে হাবুডুবু খাবে। আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক যাঁরা, তাঁরা কামিনী আর সুরা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রতিমা-পূজা পর্য্যন্ত কাউকে রেহাই দেন না নিন্দার শরজাল থেকে। কিন্তু যে মহাপাপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূর্ত্তি ধারণ ক'রে অগণিত মানুষকে পঙ্ক-কুণ্ডে নিমজ্জিত ক'রে রেখেছে—সেই মহাপাপের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-প্রচারকদের কণ্ঠ উত্থিত হয় না কেন? মানুষকে দুর্নীতির পাঁকে টেনে আনতে দারিদ্র্যের মত আর কি আছে? দৈন্যই তো মানুষের আত্মপ্রকাশের পথে সব চেয়ে বড় অন্তরায়। দারিদ্র্যই ধর্ম্মের প্রবলতম শত্রু। এই জন্যই আধুনিক ধর্ম্ম-প্রচারকদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ' তাঁর স্বভাবসুলভ সুতীব্র ভাষায় ব'লেছেন—

* শ'এর Too True To Be Goodএর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

And so we are driven to the conclusion that the modern priesthood must utterly renounce, abjure, abhor, abominate and annihilate private property as the very worst of all the devil's inventions for the demoralisation and damnation of mankind.

অর্থাৎ মানব জাতিকে দুর্নীতির আর সর্ব্বনাশের মধ্যে ঠেলে দেবার জন্য শয়তান এ পর্য্যন্ত যত কিছু উপায় আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে সেরা আবিষ্কার হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি-প্রথা বর্জ্জন করবার জন্য, নিঃশেষ করবার জন্য ধর্ম্মপ্রচারকদের উঠে পড়ে লাগতে হবে।

জমির উপরে ব্যক্তিবিশেষের অবাধ অধিকারকে নিঃশেষ করবার কথা বার্ণার্ড শ' যেমন বলেছেন, মার্কস যেমন বলেছেন, লেনিন যেমন বলেছেন, তেমনি বলেছেন আমাদের গান্ধীজী। বিলাতে গোল টেবিলের বৈঠকে গান্ধীজী যে বক্তৃতা করেছিলেন, তার মধ্যেও Expropriationএর কথা আছে। ঐ বক্তৃতায় আছে—

We have here some of us who have made a study of the privileges and the monopolies enjoyed by Europeans, but let it not be merely Europeans. There are Indians —I have undoubtedly several Indians in mind—who are to-day in possession of land which has been practically given away to them not for any service rendered to the nation but for some service rendered, I

cannot even say to the Government, because I do not think the Government has been benefited, but to some official; and if you tell me that those concessions and those privileges are not to be examined by the State I again tell you that it will be impossible to run the machinery of Government on behalf of the 'have-nots', on behalf of the dispossessed.

অর্থাৎ জাতির সেবা ক'রে নয়, কতকগুলি রাজপুরুষকে তুষ্ট ক'রে যারা বহু জমির মালিক হ'য়েছে, তাদের অধিকার বৈধ কিনা, তার বিচার করবার ক্ষমতা যদি রাষ্ট্রের না থাকে তবে সে রাষ্ট্রের দ্বারা সর্ব্বহারাদের মঙ্গল সাধন কখনো সম্ভব হবে না। যারা স্বার্থের সেবা ক'রে বহু জমির মালিক হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে—সে সম্পর্কে গান্ধীজী স্পষ্টই বলেছেন,—

If they have obtained concessions which have been obtained because they did some service to some officials of the day and got some miles of land, well, if I had the possession of the Government I would quickly dispossess them.

অর্থাৎ রাজপুরুষদের খুসী ক'রে যারা জমি পেয়েছে, গান্ধীজী রাষ্ট্রের কর্ণধার হ'লে তাদের অবিলম্বে অপসারিত করবেন জমি থেকে। যে Expropriationএর কথা আমরা ক্রোপটকিনের মুখে শুনেছি, কার্ল মার্কসের মুখে শুনেছি, সেই কথাই নূতন ক'রে আমরা শুনলাম গান্ধীজীর মুখে।

Expropriation ছাড়া সমাজের সর্ব্বসাধারণকে সুখী করবার কোন সম্ভাবনাই নেই। এই জন্যই দুনিয়ার যত সেরা সেরা চিন্তাবীর, যত যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ তাঁরা প্রায় সকলেই এক বাক্যে Expropriationকে সমাজের সর্ব্বজনীন মঙ্গলের মন্দির-দ্বারে পৌঁছাবার অপরিহার্য্য সোপান ব'লে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সকলের মঙ্গলের জন্য যাদের স্বার্থকে আঘাত করা হবে, তাদের ক্ষতিপূরণেরও কোন ব্যবস্থা করা হবে না—এমন কথাও গান্ধীজী বলেছেন বিলাতের গোলটেবিলের বৈঠকে।

...and they will be dispossessed, I may tell you, without any compensation, because, if you want this Government to pay compensation, it will have to rob Peter to pay Paul, and that would be impossible.

(৩)

এই Expropriationএর কাছে এসে আমরা রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বড় রকমের একটা ধাক্কা খাই এবং বুঝতে পারি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না পেলে Expropriation অসম্ভব। শ্রেণী-হীন অভিনব মানব-সমাজকে সৃষ্টি করবার আশায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বিলুপ্ত করতে গিয়ে হঠাৎ আমরা দেখতে পাই, রাষ্ট্র তার বজ্র-বাহু দিয়ে ঘিরে রেখেছে মুষ্টিমেয় মানুষের জমি, খনি এবং কলকারখানাগুলিকে। যে কেউ সেই বিষয়ের উপরে হস্তক্ষেপ করতে যাবে, তারই শিরে নেমে আসবে সেই বজ্রবাহুর আঘাত। রাষ্ট্রের মধ্যেই ধনীদের জীবন-মরণের সোনার কাঠি রয়েছে নিহিত। যতদিন রাষ্ট্র ধনীদের আড্ডা হ'য়ে থাকবে, ততদিন তার শক্তিকে আশ্রয় ক'রে মালিকেরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী রূপে শতসহস্র মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলবেই। কেউ তাদের সে খেলার অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে না। যদি কোনদিন এমন রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তন হয় যার লক্ষ্য হবে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ, তবেই মানুষের জীবন নিয়ে এই নিষ্ঠুর খেলার একদিন সমাপ্তি ঘটবে। তার আগে নয়। রাষ্ট্রের এইরূপ যতক্ষণ বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট হয়ে

ধরা না পড়ে, ততক্ষণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন আছে শ্রেণী-হীন সমাজ সৃষ্টির জন্য—সে কথা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য থেকে যায়।

রাষ্ট্র তার দুর্জ্জয় শক্তি নিয়ে সমাজের মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের স্বার্থরক্ষায় যদি সতত ব্রতী না থাকতো, মানুষের বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা কখনো আপনাকে টিঁকিয়ে রাখতে পারতো না। আজ তো পৃথিবীতে কোটি কোটি মানব-মানবীর নিঃস্ব হ'য়ে থাকবার কথা নয়। বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে মানুষের সভ্যতা আজ এতখানি অগ্রসর হ'য়েছে যে সমাজের প্রত্যেকটি নর-নারীর পক্ষে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করা আজ খুবই সম্ভব। মানুষ আজ কত কলকারখানা বানিয়েছে, কত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে, প্রকৃতির কত দুর্ভেদ্য রহস্যকে জেনে ফেলেছে। তবুও পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অগণিত মানুষের আজ দক্ষিণ বাহু ও পুত্র-কন্যা ছাড়া আপনার বলতে কিছুই নেই। মুষ্টিমেয় মানুষ সমস্ত সম্পদের উপরে আপনাদের অবাধ অধিকারের জোরে এই অগণিত সর্ব্বহারাদের জীবনকে অপ্রতিহত ভাবে শাসন করছে। মনের মধ্যে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে, কেন পৃথিবীর অগণিত নর-নারী এই রকম একটা জঘন্য সমাজ-ব্যবস্থাকে সহ্য ক'রে আসছে? এই প্রশ্নের উত্তর হ'চ্ছে—ধনীরা রাষ্ট্রশক্তির

দ্বারা আপনাদের স্বার্থকে এমন ভাবেই সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে যে সর্ব্বহারাদের টু শব্দটি পর্য্যন্ত করবার আজ উপায় নেই। যে মুহূর্ত্তে তারা জমি, খনি, কলকারখানাগুলির উপরে আপনাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাবে (the liberation of the oppressed can only be achieved in a society of common ownership) সেই মুহূর্ত্তে তারা দেখবে, সম্মুখে রাষ্ট্রের অগণিত সঙ্গীন আর লাঠি উদ্যত হয়ে আছে। রাষ্ট্রের এই দুর্জ্জয় শক্তিকে ব্যর্থ না ক'রে সম্পদ-সৃষ্টির উপায়গুলির উপরে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। এই জন্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আগে অর্জ্জন করতে না পারলে সেই নূতন জগতকে সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব নয় যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন-পাত্র পূর্ণ হ'য়ে উঠবে মুক্তির আর আনন্দের অমৃতে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন আর সর্ব্বহারাদের মুক্তি তো এক কথা নয়। যারা সমাজের সাধারণ মানুষ তারা সংস্কারের ক্রীতদাস। নূতনের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে একটা বিপুল উন্মাদনায় তারা পুরাতনকে ভাঙে বটে কিন্তু সে উন্মাদনা তো বন্যার জলের মতই ক্ষণস্থায়ী। উন্মাদনা যখন চ'লে যায় তখন পুরাতন সংস্কারের শক্তি জনসাধারণের মনকে আবার অভিভূত ক'রে ফেলে। যারা প্রতিক্রিয়াপন্থী তারা জনসাধারণের চিত্তের এই দুর্ব্বলতার রহস্য ভালো ক'রেই জানে

আর জানে ব'লেই তাদের দলে টেনে আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সে চেষ্টা যখন সাফল্য লাভ করে তখন এত তপস্যায় অর্জ্জিত রাষ্ট্রশক্তিও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের করতলগত হয়। এই সর্ব্বনাশ যাতে না ঘটে সেইজন্যই dictatorship of the proletariatএর মত সম্পূর্ণ অভিনব-ধরণের রাষ্ট্রের প্রয়োজন। পুরাতন রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করা কঠিন, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন হচ্ছে নূতন রাষ্ট্রশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখা। জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভর করলে তারা শ্রেণী-হীন সমাজ সৃষ্টির জন্য তাদের ভোট দেবার ক্ষমতাকে কতখানি ব্যবহার করবে—সেটা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়। ইংলণ্ডের প্রাপ্তবয়স্ক সমস্ত নর-নারীই তো ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে—কিন্তু সে অধিকারকে তারা কতখানি ব্যবহার করেছে ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের মত আরও অনেক দুর্ভাগা দেশকে সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বেঁধে রাখবার জন্য আর কতখানি ব্যবহার করেছে শ্রেণী-হীন সমাজ সৃষ্টির জন্য—সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। পার্লামেণ্টের যারা কর্ণধার—তারা সোমবারে যে কথা বলে, বুধবারে বলে তার উল্টো কথা। জনসাধারণ নেতাদের মতের এই ডিগবাজির কোনো প্রতিবাদই করে না। নিজেদের মন ব'লে কিছু থাকলে তবে তো তারা প্রতিবাদ করবে! ভারতবর্ষকে বশীভূত রাখবার জন্য

একশোটা জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি করতে যাদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই, আয়র্ল্যাণ্ডের আর মিশরের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখবার জন্য বে-পরোয়াভাবে লাঠি আর গুলি চালাতে যারা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না—তাদেরই মত মনোভাবসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদী মানুষেরা বিলাতের জনসাধারণের ভোটের জোরে বারে বারে হয় পার্লামেণ্টের সদস্য। সাম্যবাদী শ্রমিকেরা দলে দলে এসে ভোট দেয় চার্চ্চিল, সাইমন আর বলডুইনের মত গণতন্ত্রের শত্রুকে যারা ভারতবর্ষের উপরে নূতন শাসনতন্ত্র জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। ভারতবর্ষ, আয়র্ল্যাণ্ড অথবা মিশর নিপীড়িত হোক—এই রকম একটা শয়তানী উদ্দেশ্য নিয়ে বিলাতের লোকেরা যে চার্চ্চিল-কোম্পানীকে ভোট দেয়, তা নয়। আসলে তাদের নিজস্ব দৃষ্টি ব'লে কিছু নেই। সভায় গিয়ে যা শোনে, খবরের কাগজে যা পড়ে—তাই থেকেই গঠিত হয় তাদের মত। সুতরাং Adult suffrage, Democracy —এই সব গাল-ভরা কথা যতই শ্রুতিমধুর হোক, তাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে যাওয়া বিপজ্জনক। যাদের নিজেদের একটা মতামত আছে, তাদের বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ভালো ক'রে তলিয়ে কোন জিনিষ বুঝবার শক্তি নেই যাদের, তাদের ভোটের উপরে নির্ভর ক'রে পার্লামেণ্টের সাহায্যে

শ্রেণী-হীন সমাজ গড়তে যাওয়া দূরদর্শিতার পরিচয় নয়। এইজন্যই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শূন্য আসনে যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া সমীচীন, তার রূপ হবে সম্পূর্ণ নূতন। এই নূতন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ হবেন সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। অত্যন্ত শৃঙ্খলার এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের কাজ করতে হবে দলবদ্ধ ভাবে। জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভর ক'রে শাসনদণ্ড পরিচালনা করলে চলবে না। দুর্জ্জয় শক্তিকে সহায় ক'রে তাঁরা নূতন সমাজ-সৃষ্টির পরিকল্পনাকে ধীরে ধীরে রূপ দেবেন। তাঁরা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধারণের মঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করতে বাধ্য করবেন; সমাজে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবেন তাঁরা—যার ফলে একজনকে খাটিয়ে আর একজনের পক্ষে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া অসম্ভব হবে। এই যে নূতন ধরণের রাষ্ট্র, এরই নাম হ'চ্ছে dictatorship of the proletariat. পুরাতন সমাজের যে সব সংস্কার অখণ্ড প্রতাপে মানব-মনের উপর আজও আধিপত্য করছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে—তাদের বিরুদ্ধে নির্ম্মম এবং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যেই হ'চ্ছে dictatorship of the proletariatএর আসল রূপটি। শ্রেণী-হীন সমাজকে সৃষ্টি করবার পথে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই আজন্ম-সঞ্চিত সংস্কারের শক্তি যে একটি প্রবলতম অন্তরায়—এতে কি সন্দেহ করবার কিছু আছে ?

এই dictatorship of the proletariat-এর যুগ কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। সর্ব্বহারাদের এই যে একাধিপত্য—এই একাধিপত্যের প্রয়োজন থাকবে ততদিনই, যতদিন শ্রেণী-হীন সমাজ সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হ'চ্ছে। শ্রেণী-হীন সমাজের আদর্শ যখন বাস্তব জগতে সত্য হয়ে উঠবে, তখন রাষ্ট্রের কোনোই প্রয়োজন থাকবে না। যতক্ষণ সমাজে ধনী-দরিদ্র ব'লে পৃথক্ পৃথক দুটী শ্রেণী আছে, ততক্ষণ রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন আছে শ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। যখন সমাজে ধনকুবেরদের প্রভুত্ব ছিল, তখন তাদের সম্পত্তিকে রক্ষা করবার জন্য সর্ব্বহারাদের দাবিয়ে রাখবারও প্রয়োজন ছিল। দাবিয়ে রাখবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি-প্রয়োগের যন্ত্র হ'চ্ছে রাষ্ট্র। সর্ব্বহারাদের দাবীকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল, তার নাম হ'চ্ছে dictatorship of the capitalist. ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণী-হীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার কোনো আশা নেই। শ্রেণী-হীন সমাজ তৈরী করতে হ'লে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর প্রয়োজন আছে। যারা এত দিন পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিব্যি আরামে তাদের বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করছিল, তারা প্রাণপণে চেষ্টা করবে শ্রেণী-হীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার উদ্যমকে ব্যর্থ করবার জন্য। ঘরে বাহিরে যে সব শত্রু সমাজে ধনকুবেরদের

প্রভুত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চক্রান্ত করবে—তাদের চক্রান্তকে বিফল করতে হ'লে সর্ব্বহারাদের পক্ষ থেকে শক্তি-প্রয়োগের নূতন যন্ত্র চাই। সর্ব্বহারাদের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য শক্তি-প্রয়োগের এই নূতন যন্ত্রই হ'লো সেই অভিনব রাষ্ট্র যার নাম dictatorship of the proletariat. ক্রমে ক্রমে যখন সমাজের সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে—জমি, খনি, কলকারখানার উপরে সর্ব্বসাধারণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে—জনসাধারণের মন থেকে আবাল্য-সঞ্চিত সংস্কারের আধিপত্য লোপ পাবে—নতুন মানুষ নতুন দৃষ্টি নিয়ে দিগন্তে দেখা দেবে—তখন সর্ব্বহারাদের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য dictatorship of the proletariat-এর কোন প্রয়োজন থাকবে না—নতুন রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে—the state will wither away.

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই যেখানে—এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থার কথা ধনতান্ত্রিক দেশের লোকেরা আজও পর্য্যন্ত ভাবতে পারে না। তাদের ধারণা, সমাজে সব সময়েই এমন অনেক দুষ্ট লোক থাকবে যারা চুরি করবে, ব্যাঙ্ক ভাঙবে, আরও অনেক রকমের দুষ্কার্য্যে ব্রতী হবে এবং এই সব দুষ্টলোকদের দমন করবার জন্য রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন থাকবে চিরকাল। এই সব

বিজ্ঞ লোকেরা একটা কথা ভুলে যান। যারা অপরাধ ক'রে জেল ভর্ত্তি করে তাদের অধিকাংশই চোর-ডাকাত এবং চুরি-ডাকাতি তারা যে করে—সে নিতান্তই পেটের দায়ে। অপরাধীদের অধিকাংশই হচ্ছে নিঃস্ব নর-নারীর দল যাদের জীবন কঠোর দারিদ্র্যের অভিশাপে অভিশপ্ত। এমন অভিনব সমাজ যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি যেখানে কোন অবস্থাতেই দৈন্যের দ্বারা নিপীড়িত হবার আশঙ্কা থাকবেনা নর-নারীদের মনে—তবে সেই ভাবী সমাজে অপরাধীর সংখ্যা যে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাবে, এতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। অভাবই লোকের স্বভাবকে নষ্ট করে। দৈন্য যেখানে রূপান্তরিত হয়েছে প্রাচুর্য্যের মধ্যে সেখানে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেতে বাধ্য। অপরাধী যদি না থাকে, অপরাধীকে দমন করবার জন্য রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন থাকতে পারে না। এই জন্যই সোস্যালিষ্টরা যে ভাবী সমাজের স্বপ্ন দেখে থাকেন সেখানে মানুষকে দমন করবাঁর জন্য শক্তি-প্রয়োগের কোনো স্থান নেই। সেই সমাজে রাষ্ট্রের স্থান যাদুঘরে—মানুষের অতীত-ইতিহাসের নিদর্শনগুলির তালিকায়।

কিন্তু এমন সমাজ কি সত্য সত্যই কোনো দিন আসবে যেখানে সব মানুষ সব সময়ের জন্য মনুষ্যত্বের পূর্ণগরিমায়

দেদীপ্যমান থাকবে? মানুষের মনে কাম থাকবে না, হিংসা থাকবে না, ঈর্ষা থাকবে না—এমন যুগের আবির্ভাব কি কোনো দিন সম্ভব হবে? সোস্যালিষ্টরা এমন অসম্ভব কথা কোনদিনই বলে না। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে মালিন্য চির-দিনই থাকবে,—মানুষের আচরণে দোষ-ত্রুটি চিরদিনই ঘটবে। কিন্তু শ্রেণী-হীন সমাজে মনুষ্য-স্বভাবের এই সব সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবিধানের জন্য শাস্তি বিধানের এত নিষ্ঠুর সাজসরঞ্জাম নিশ্চয়ই থাকবে না। জেলখানা, বেত্রাঘাত, ফাঁসি অতীতের বর্ব্বরতার চিহ্নরূপে পরিগণিত হবে। এখন সমস্যা হ'চ্ছে কেমন ক'রে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঔদ্ধত্যের অবসান করা যায়। সেই ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটানোর উপায় নির্ভীকতা। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নরনারী রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে ব'লেই তার আধিপত্য আজও কায়েম আছে। কেন স্বীকার ক'রে নিয়েছে—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন হাক্স্‌লি তাঁর Ends and Means নামক গ্রন্থে। তিনি বলছেন, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী মানুষ রাষ্ট্রের উদ্ধত শাসনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে এই যে বংশ পরম্পরায় দুঃসহ অবিচারকে আর যাতনাকে সহ্য ক'রে চলেছে—ইতিহাসে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সত্য সত্যই চমক-প্রদ। Most men and women are prepared to tolerate the

intolerable. এই অমার্জ্জনীয় ধৈর্য্যকে সম্ভব করছে মানুষের স্বভাবের দুর্ব্বলতা তার ভীরুতা। এই ভীরুতা থেকে মুক্ত ক'রে মানুষকে নির্ভীক ক'রে তোলাই হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের রহস্য। এই রহস্যের কথাই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

(৪)

আপনাকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করবার পথে দারিদ্র্য একটি প্রবলতম অন্তরায়। জীবন যেখানে দৈন্যের অভিশাপে অভিশপ্ত, সেখানে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। কাল খাবো কি—এই দুর্ভাবনা যেখানে দিবারাত্রির সাথী, সেখানে মানুষ বড়-কিছুর কথা ভাবতে পারে না। এই জন্যই সাম্যবাদীরা দারিদ্র্যের উপরে এমন খড়্গহস্ত। তারা সমাজে আনতে চায় এমন একটা নূতন অবস্থা যেখানে দৈন্য নেই, যেখানে ঘরে ঘরে ভাত-কাপড়ের প্রাচুর্য্য।

একথা অবশ্য মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, সম্পদের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে উন্নত জীবনের অঙ্গাঙ্গী কোনো সম্পর্ক আছে। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত যারা, তারাও অনেক সময় অর্থহীন পঙ্কিল জীবন যাপন ক'রে থাকে। আবার এমন লোক আছে যাদের দৈন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে তাদের অন্তরের মহিমায়। কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা বিরল। দৈন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনকে পঙ্গু ক'রে দেয়। যারা দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত—তারা অন্ততঃ একটা বিষয়ে ভাগ্যবান। তাদের অস্তিত্বের উপরে সদাসর্ব্বদার জন্য

জেগে থাকে না—চাকুরি হারানোর ভয়, অনাহারের দুশ্চিন্তা।

তাই দারিদ্র্যের বিষবৃক্ষকে সমাজ থেকে উন্মূলিত করবার জন্য সাম্যবাদীরা যে অভিযান চালাচ্ছে দিকে দিকে, তার সাফল্য কামনা করবে প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান পুরুষ এবং বুদ্ধিমতী নারী। দারিদ্র্যকে প্রাচুর্য্যের মধ্যে যতক্ষণ রূপান্তরিত করতে না পারছি, ততক্ষণ নতুন মানুষ দিয়ে নতুন সমাজ গড়বার কোনোই আশা নেই। সাম্যবাদীদের প্রচার-কার্য্য সম্পর্কে আমার শুধু একটি বিরুদ্ধ মন্তব্য করবার আছে। দারিদ্র্যকেই আমাদের দুঃখের কারণ বলা ঠিক নয়। দারিদ্র্য সামাজিক ব্যাধির কারণ নয়; দৈন্য রোগের লক্ষণ। রোগের মূল নিহিত রয়েছে আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতার মধ্যে আর সেই সর্ব্বনেশে দুর্ব্বলতার নাম হচ্ছে ভীরুতা। হাজার হাজার নর-নারী যে আজ দারিদ্র্যের অভিশাপে অভিশপ্ত, তার কারণ ক্রীতদাসের শৃঙ্খলকে তারা স্বীকার ক'রে নিয়েছে জীবনে। দরিদ্র ব'লে তারা ক্রীতদাস নয়, ক্রীতদাস ব'লেই তারা দরিদ্র। আর মানুষ গোলামির গ্লানিকে তখনই সহ্য করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—যখন ক্লৈব্য এসে তার আত্মাকে গ্রাস করে। দারিদ্র্যের মূলে দাসত্ব আর দাসত্বের মূলে আধ্যাত্মিক অবনতি।

সোস্যালিষ্টরা মানুষের বাহিরের দৈন্যকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখতে গিয়ে ভুলে যায়, তার দুঃখ-দুর্দ্দশার আসল ভিত্তি ক্লৈব্য, ভীরুতা, আত্মার শোচনীয় অধোগতি।

পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ একরকমের নয়। অনেক দুঃখ আছে যাদের আমরা বলতে পারি আধিভৌতিক (physical evils)—যেমন রোগ, বেদনা, মৃত্যু, জমির অনুর্ব্বরতা। আবার এমন দুঃখ আছে যাদের উৎপত্তি হ'চ্ছে আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা থেকে। ইচ্ছা শক্তির দৌর্ব্বল্য, প্রবৃত্তির আতিশয্য—এসব দুঃখের মূলে আমাদের চরিত্রের গলদ। আর একরকমের দুঃখ আছে, যার উৎপত্তি হচ্ছে মানুষের উপরে মানুষের অথবা দলের উপরে দলের প্রভুত্ব থেকে। আধিভৌতিক যে দুঃখ, তাকে পরাজিত করবার অস্ত্র হ'চ্ছে বিজ্ঞান। চরিত্রের দুর্ব্বলতা থেকে যে দুঃখের উৎপত্তি তার বিনাশের উপায় শিক্ষা। কিন্তু মানুষের উপরে মানুষের এবং দলের উপরে দলের যে অত্যাচার—তার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ হ'চ্ছে প্রচলিত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন। এমন একটা অভিনব সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে হবে যেখানে একজন মানুষের পক্ষে আর একজন মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।

এই যে শেষোক্ত দুঃখ যার মূলে রয়েছে মানুষের উপরে

মানুষের, সম্প্রদায়ের উপরে সম্প্রদায়ের এবং জাতির উপরে জাতির অসহনীয় আধিপত্য—এই দুঃখই তো দৈন্যের মূর্ত্তি ধারণ ক'রে অগণিত মানুষের জীবনকে পঙ্গু ক'রে দিচ্ছে। অথচ এ পঙ্গুত্ব অনিবার্য্য নয়। সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষকে মানুষের গ্রাস থেকে মুক্ত করা খুবই সম্ভব।

মানুষের উপরে মানুষকে আধিপত্য করবার সুযোগ দিয়েছে কে? সুযোগ দিয়েছে ধনের স্পর্দ্ধা। ঐশ্বর্য্যের সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় মানুষ কোটী কোটী মানুষের আত্মপ্রকাশের পথকে অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ধনগত বৈষম্য যেখানে বিদ্যমান, সেখানে স্বাধীনতার অস্তিত্ব কেমন ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? ধনীরা তাদের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যকে স্বভাবতই ব্যবহার করবে লক্ষ্মীছাড়াদিগকে এক একটি ক্রীতদাস বানাবার জন্য। তারা রাষ্ট্রের শক্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যে, দরিদ্রের দারিদ্র্য দিনে দিনে তীব্রতর হ'য়ে উঠবে। তারা শিক্ষামন্দিরগুলিকে পরিণত করবে এক একটি গোলাম-খানায়। তাদের অর্থে পরিপুষ্ট ধর্ম্মযাযকেরা পর্য্যন্ত এমন বাণী প্রচার করবে—যা সমাজে ধনীদের আধিপত্যকে রাখবে অক্ষুণ্ণ। সমাজে ধনী আর দরিদ্র ব'লে যতক্ষণ দুটি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, ততক্ষণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সাম্য অসম্ভব, কারণ শাসনতন্ত্রকে পরিচালিত করবে তারাই—যাদের হাতে থাকবে

লক্ষ্মীর ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি। ঐশ্বর্য্যের জোরে মানুষ মানুষের জীবন নিয়ে কি সর্ব্বনেশে খেলা খেলতে পারে—তার প্রমাণ পেয়েছে মানুষ যুগে যুগে এবং সেই জন্যই যুগে যুগে মানুষ স্বপ্ন দেখে এসেছে সেই Utopiaর যেখানে আর্থিক বৈষম্যের ঘটেছে বিলোপ, ঐশ্বর্য্যের স্পর্দ্ধার হয়েছে অবসান। অর্থ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হ'লে কতখানি অনর্থ ঘটাতে পারে সমাজ-জীবনে, মার্কস মর্ম্মে মর্ম্মে তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধিরই প্রকাশ কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর পাতায় পাতায়। সমাজকে শাসন ক'রছে কারা? যাদের টাকা আছে তারাই। শাসন করবার এই ক্ষমতা তারা পায়নি চরিত্রবল থেকে, পেয়েছে ঐশ্বর্য্য থেকে। তাদের প্রভাবের মূলে তারা নিজেরা নয়, তাদের ধনভাণ্ডার। লাস্কির ভাষায়, They act by owning.

ঐশ্বর্য্যের সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় মানুষ অগণিত মানুষকে বানিয়ে রেখেছে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক। ধনের প্রাচুর্য্যের সুবিধা নিয়ে কতকগুলি মানুষ অসংখ্য মানুষের জীবনে করছে অপ্রতিহত-প্রভাবে আধিপত্য। প্রধানতঃ ঐশ্বর্য্যই মানুষকে দিয়েছে অন্যের জীবনে এই আধিপত্য করবার ক্ষমতা আর হাজার হাজার মানুষ নতমস্তকে এই আধিপত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে

সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলতে চায়। রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ মানেই দুঃখকষ্ট, অনাহার, লাঞ্ছনা, কারাগার, মৃত্যু। তার সঙ্গে লড়াই করা তো ছেলেখেলা নয়। মেসিনগানকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখীন হ'তে অধিকাংশ লোকই ভয় পায়। আর এই ভীরুতার উপরে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য্যের প্রতাপ। যতদিন পারে মুখ বুজে মানুষ দারিদ্র্যের দুঃসহ যাতনাকে সহ্য ক'রে চলে। তারপর একদিন আসে যখন যাতনা সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করে। সেদিন মানুষ বাঁধন ছেঁড়ার জন্য মরিয়া হ'য়ে ওঠে, মৃত্যুভয় তার কাছে তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। সমুদ্রের অগণিত তরঙ্গের মত মানুষের পর মানুষ উদ্দামবেগে ছুটে চলে মৃত্যুর শাসনকে ভাঙবার জন্য। বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ঝাপটায় ভেঙে পড়ে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা, সমস্ত বৈষম্যের হয় অবসান, ঝড়ের রাতের শেষে আসে শান্তির নির্ম্মল প্রভাত আর সেই প্রভাতের আলোর মধ্যে ঝলমল করে সাম্যের স্বর্গ। ইতিহাসে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যকে দূরীভূত করবার জন্য কতবারই না এলো এই বিদ্রোহের বন্যা। কতবারই না আমরা দেখলাম শান্ত শিষ্ট মানুষকে সহসা রুদ্রমূর্ত্তিতে জেগে উঠতে, চড়াই পাখীকে বাজপাখীতে আর গর্দ্দভকে সিংহে রূপান্তরিত হ'তে।

কিন্তু আগেই বলেছি, জনসাধারণ সহজে কখনো সংঘর্ষের

মধ্যে আসতে চাইবে না। দীর্ঘকাল ধ'রে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে মানতে মানতে তারা বিশ্বাস করে—এই রকম ব্যবস্থাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। নির্ব্বিচারে যারা গ্রহণ করে কোনো কিছুতে সত্য ব'লে, তারা আর যুক্তির কষ্টিপাথরে তাদের ধারণাকে যাচাই করতে চায় না। অন্যে যা নির্দ্দেশ দেয়, সেই নির্দ্দেশকেই অন্ধের মত তারা অনুসরণ করে। নিজেদের ব্যক্তিত্ব ব'লে তাদের আর কিছু থাকে না। কোন্ পথে তাদের কল্যাণ, সে বোধ তারা হারিয়ে ফেলে।

একদিকে বুদ্ধির এই জড়তা এবং আর একদিকে সাহসের একান্ত অভাব—এইখানেই দাসত্বের মূল। আগে ভাঙতে হবে বুদ্ধির জড়তা, মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং পরে তাকে শেখাতে হবে স্বাধীনতার মন্দিরে উপনীত হবার একমাত্র পথ হ'চ্ছে শৌর্য্যের পথ। যারা পরাধীন তাদের জীবনের সকলের চেয়ে বড় কলঙ্ক হ'চ্ছে ভীরুতা।

তাই তো গান্ধীজী আমাদের কানে বারে বারে শোনালেন সাহসের সঙ্গে দুঃখকে বরণ করবার বাণী। তিনি বললেন, The cell-door is the door to freedom. মুক্তির মন্দির-দ্বারে পৌঁছানোর পথটি হ'চ্ছে কারাকক্ষে প্রবেশ করবার পথ। Innocence under an evil government must

ever rejoice on the scaffold—এও গান্ধীজীর কথা। A slave, to be free, must continuously rise against his slavery and be locked up in his master's cell for rebellion. ক্রীতদাস যে, তাকে মুক্ত হ'তে হ'লে দাসত্বের বিরুদ্ধে বারে বারে তাকে দাঁড়াতে হবে আর বরণ ক'রে নিতে হবে তার প্রভুর দেওয়া কারাবন্ধনকে। এমনি ক'রে কত ছন্দে, কত সুরে গান্ধীজী আমাদের কানে বারম্বার উচ্চারণ করলেন বাঁধন-ছেড়ার মাভৈঃ মন্ত্র। অহিংসার বাণী তিনি প্রচার ক'রেছেন কিন্তু সে অহিংসা দুর্ব্বলের অহিংসা নয়, মৃত্যুজয়ী বীরের অহিংসা। যে কথা দিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলাম—সেই কথা দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করি। আমরা যারা সোস্যালিষ্ট ব'লে নিজেদের প্রচার করি—আমাদের একটা জায়গায় বড় ভুল হচ্ছে। আমরা দারিদ্র্যের অভিশাপকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখছি। দারিদ্র্য সর্ব্বনেশে, সন্দেহ নেই। কিন্তু দারিদ্র্যের অভিশাপের চেয়েও বড়ো অভিশাপ হ'চ্ছে ভীরুতার অভিশাপ। আমাদের আত্মা হারিয়ে ফেলেছে শৌর্য্যের অগ্নিশিখা—সেই জন্যই আমরা ঐশ্বর্য্যের আধিপত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। আমরা ক্রীতদাসের জীবনকে নীরবে মেনে নিয়েছি—তাই তো দারিদ্র্য আমাদের চিরসাথী। আমরা যেদিন ভয়কে বর্জ্জন করতে পারবো, সেদিন ঐশ্বর্য্যের

আধিপত্যের তিরোধানের সঙ্গে আমাদের দারিদ্র্যেরও তিরোধান ঘটবে। দুই একজনের নির্ভীকতাকে আশ্রয় ক'রে সেই নবযুগ আসবে না যেখানে দাসত্বের অবসান ঘটবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন রাষ্ট্রের ঔদ্ধত্যকে ভাঙবার জন্য দুঃখের আগুনে ঝাঁপ দিতে শিখবে তখনই মানুষের সমাজে আসবে ন্যায়ের নবপ্রভাত। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায়—Courage must be democratised before it can make men humane. * এই জন্য চাই গণসংযোগ যার কথা পরবর্ত্তী অধ্যায় বলা হয়েছে।

* What I believe P. 81

(৫)

ভবিষ্যতের শ্রেণী-হীন সমাজের স্বপ্ন যতই মধুর হোক, বর্ত্তমান বড় বিষময়। যারা ধনিক তারা সংঘবদ্ধ। অপ্রতি-হত-প্রভাবে তারা শাসন করছে অসংখ্য মানুষের অভিশপ্ত জীবনকে। সংঘবদ্ধ ব'লেই ধনিকেরা বিশৃঙ্খল সর্ব্বহারাদের এমন ক'রে পদানত ক'রে রাখতে সমর্থ হয়েছে। যে দিন তুনিয়ার সর্ব্বহারার দল ধনীদের মতই সংঘের শরণ নেবে সেদিন থেকে সুরু হবে তাদের নব-জীবনের জয়যাত্রা। যাদের কিছু নেই তাদের পক্ষে সব পাওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন কত বেশী একথা বুঝেছিলেন কার্ল মার্কস আর ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (Fredrich Engels) এবং সেই জন্যই The Communist Manifestoর শেষলাইনে বজ্র-গর্জ্জনে ঘোষিত হ'য়েছে Proletarians Of All Lands, Unite !

সর্ব্বহারারা তখনই সংঘবদ্ধ হবে যখন তারা জানবে তাদের শক্তির প্রাচুর্য্যকে। আজ যে তারা দারিদ্র্যের তুঃসহ তুঃখকে নিঃশব্দে বহন ক'রে চলেছে, তার কারণ তাদের অজ্ঞতা। তারা জানে তুঃখের বোঝা বইবার জন্যই তাদের জন্ম, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘাড় থেকে সে বোঝা নামবার

কোনই আশা নেই। দুঃখকে যারা নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধান ব'লে মেনে নিয়েছে, তাদের দুঃখ ঘোচাবে কে? দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে তাদের মুক্তি পাওয়ার পথ তখনই প্রশস্ত হবে যখন তারা বলতে পারবে, অদৃষ্টের হাতে আমরা অসহায় ক্রীড়নক নই, আমরাই আমাদের ভাগ্যের বিধাতা।

সর্ব্বহারাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী যে সর্ব্বহারারাই, এই সত্যই তাদের কর্ণকূহরে বারম্বার উচ্চারণ করবার দিন এসেছে আজ। তাদের বুঝিয়ে দাও, বাসুকী নাগ যেমন ক'রে তার সহস্র ফণা দিয়ে ধ'রে রেখেছে এই বসুন্ধরাকে—তেমনি ক'রেই সর্ব্বহারারা তাদের লক্ষ লক্ষ বাহুর পরিশ্রম দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এই পৃথিবীকে। এ পৃথিবীর ভাগ্য, এ পৃথিবীর জীবন একান্ত ভাবে নির্ভর ক'রছে তাদেরই উপরে। তাদেরই শক্তিকে, তাদেরই সেবাকে, তাদেরই বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে সংসার এখনও পর্য্যন্ত টিকে আছে। তাদের শক্তি না পেলে সংসার এক মুহূর্ত্তে অচল হ'য়ে যায়; ধানের একগাছি শীষও জন্মায় না, একটি আলপিন পর্য্যন্ত দুর্লভ হ'য়ে ওঠে।

সর্ব্বহারা শ্রমিকের দল যখন থেকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারবে সমাজ-জীবনে তারা কতখানি অপরিহার্য্য, তখন থেকেই সুরু হবে তাদের মুক্তির পালা। তখন থেকে

আপনাদের শক্তির প্রাচুর্য্য সম্পর্কে সচেতন হবে তারা, বুঝতে শিখবে ভাতের জন্য ধনীদের দুয়ারে যে কোন মূল্যে আপনাদের দক্ষিণ হস্ত বিক্রয় করতে তারা একেবারেই বাধ্য নয়। এই চেতনা তাদের রসনায় এনে দেবে 'না' বলবার দুর্জ্জয় শক্তি। তারা বলতে স্থরু করবে, আমরা ইচ্ছা ক'রে সিন্ধুবাদ নাবিকের মতো বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার এই নিষ্ঠুর বুড়োটাকে আর বইবো না, ঐশ্বর্য্যের এই আকাশস্পর্শী স্পর্দ্ধাকে আর সইবো না। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের পৌরুষ-ভরা কণ্ঠ থেকে এই সর্ব্বনেশে 'না' শব্দটী যখন উৎসারিত হবে আকাশে আকাশে, তখনই রাষ্ট্রে এবং সমাজে স্থরু হবে বিরাট ভূমিকম্প আর সেই ভূমিকম্পের দুর্বার আঘাতে মৃত্যুর আধিপত্য পড়বে ধূলায় লুটিয়ে।

যতক্ষণ না আমরা কোটি কোটি সর্ব্বহারাকে এই 'না' বলতে শেখাতে পারছি, ততক্ষণ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রভুত্ব অবিচলিত থাকবেই। দু-এক জন 'না' বললে হবে না; সবাইকে একই সঙ্গে বলতে হবে 'না' আর এই 'না'এর পিছনে থাকবে এমন একটা কঠোর সংকল্প যাকে টলাতে পারবে না পৃথিবীর কোনো শক্তি। সবাইকে একই সঙ্গে 'না' বলাতে হ'লে আমাদের শরণ নিতে হবে সংঘের দুর্জ্জয় ক্ষমতার। চাষী এবং মজুর সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করার উপরে নির্ভর করছে

আমাদের জয়ের সম্ভাবনা। ধনীরা যেমন সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ ক'রে আসছে—সর্ব্বহারাদেরও তেমনিভাবে সংঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করতে হবে। আগেই ব'লেছি, ধনীদের সংঘের নাম হোলা রাষ্ট্র আর সেই রাষ্ট্রের হাতে দুর্জ্জয় মারণ অস্ত্রের প্রাচুর্য্য। কিন্তু সর্ব্বহারাদের তেমন সংঘ তো আজও পর্য্যন্ত গ'ড়ে ওঠে নি। সংঘ ব্যতীত সংঘকে কাবু করবার কোনোই উপায় নেই। সর্ব্বহারারা আজও শতধা বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই; কারণ কংগ্রেস দিনে দিনে যে রকম শক্তি সঞ্চয় করছে তাতে আশা হয়, সর্ব্বহারার দল অদূর ভবিষ্যতে অজেয় হ'য়ে উঠবে। রাষ্ট্র যে হিসাবে ধনীদের দুর্গ, কংগ্রেসও সেই হিসাবে সর্ব্বহারাদের দুর্গ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের যে অভিযান, সেই অভিযানের মধ্যে সর্ব্বহারাদের একটা নূতন জগতকে জয়-করবার দুর্দ্দমনীয় সংকল্পই কি প্রকাশ পাচ্ছে না? কংগ্রেস যদি সর্ব্বহারাদের দুর্গ না হয়, তবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী ক'রে তুলবার কোনই মানে হয় না। গান্ধীজী ও জওহর-লালের মত সর্ব্বহারাদের অকৃত্রিম বন্ধুরা যে কংগ্রেসের পতাকামূলে আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গ ক'রেছেন তার কারণ তাঁরা জানেন, কংগ্রেস ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষর দীন-দরিদ্র নর-নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং

তাদের কল্যাণই কংগ্রেসের ধ্রুবতারা। লণ্ডনে গোল টেবিলের বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন,—

Above all, the Congress represents, in the essence, the dumb, semi-starved millions scattered over the length and breadth of the land in its seven thousand villages, no matter whether they come from what is called British India or what is called Indian India. Every interest which, in the opinion of the Congress, is worthy of protection, has to subserve the interests of these dumb millions.

আসলে কংগ্রেস হ'চ্ছে ভারতের সাতলক্ষ পল্লীগ্রামের অনশন-ক্লিষ্ট, ভাষা-হীন কোটি কোটি নরনারীর স্বার্থকে রক্ষা করবার দুর্গ। মৌন-মূক এই লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থের যা বিরোধী, কংগ্রেস কখনও তাকে সমর্থন করবে না।

কংগ্রেস এখনও যদি পুরামাত্রায় কৃষকসংঘে পরিণত না হ'য়ে থাকে, তাকে গালি দেবার প্রয়োজন নেই। যে ভাবে কংগ্রেসের বাণী ছড়িয়ে পড়ছে জনসাধারণের মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এবং যে ভাবে তার শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস কৃষক এবং শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবেই। গান্ধীজীর ভাষায়,

It is, therefore, essentially a peasant organisation, or it is becoming so progressively.

এখন আমাদের সামনে সকলের চেয়ে বড় যে কাজটি প'ড়ে

রয়েছে তা হ'চ্ছে—কংগ্রেসকে সর্ব্বহারাদের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা। Organised Labour—এই মন্ত্রই হোক আজকের দিনে আমাদের রাজনীতিক জীবনের গায়ত্রী মন্ত্র। যতই Classless Society, Expropriation, Complete Independence প্রভৃতি বড় বড় কথা বলি না কেন, কৃষক আর শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে না পারলে আমরা কিছুতেই কিছু করতে পারবো না।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের আইডিয়ালিজমকে আশ্রয় ক'রে সাম্যের এবং স্বাধীনতার আদর্শ দিকে দিকে প্রচারিত হবে সন্দেহ নেই—তারাই হবে মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রদূত। কিন্তু সাম্যের নূতন জগতকে সৃষ্টি করতে হ'লে কয়েক সহস্র শিক্ষিত নর-নারীর ত্যাগে আর শৌর্য্যে কুলাবে না। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা ক'রে যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায় তখনই আসে স্বাধীনতার নববসন্ত। যেমন ক'রে সমুদ্রের অগণিত ঢেউ-রাশি উপর্য্যুপরি আঘাত করে তটভূমিকে—তেমনি ক'রে দুর্দ্ধর্ষ নর-নারীর দল যেখানে কাতারে কাতারে ছুটে চলে ঔদ্ধত্যকে বাধা দেবার জন্য, সেইখানেই গড়ে ওঠে মুক্তির অভ্রভেদী মন্দির। এই জন্যই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঔদ্ধত্যকে ধূলিসাৎ করতে হ'লে গণসংযোগ ব্যতীত উপায় নেই।

যা কিছু জনগণের সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে বর্জ্জন করতে হবে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে যেমন ধনীদের ঐক্যের প্রকাশ, কংগ্রেসকে তেমনি সর্ব্বহারাদের সংহতিতে পরিণত করা চাই। যত বেশী লোককে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করা যাবে, সর্ব্বহারাদের কল্যাণের পথ ততবেশী প্রশস্ত হবে। অমুক খবরের কাগজের সম্পাদক, অমুক পেটি বুর্জ্জোয়া, তারা সর্ব্বহারাদের শত্রু—এই রকম বর্জ্জন-ধর্ম্মী মনোবৃত্তি নিয়ে যারা আজকের দিনে চলতে চায়, তারা প্রকৃতপক্ষে কৃষক ও মজুরদের স্বার্থকে আঘাত করবে। In contemporary society, the proletarians are those who can have no capital to live on, worker and professor, artist and petty bourgeois alike. এই কথাগুলি লিখিত হয়েছিলো ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মার্কস ও এঞ্জেলসের কমিউনিষ্ট জার্ণালে এবং আজ পর্য্যন্ত তাদের সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রলিট্যারিয়েট আর পেটি বুর্জ্জেয়াদের মিলিত হবার প্রয়োজন দেখিয়ে তাঁরা লিখেছিলেন—Let us unite, unity cannot fail to advantage us both.

যারা ঠিক সর্ব্বহারাদের দলে পড়ে না অথচ ধনীও নয়—তাদের উচিত হচ্ছে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া, কারণ কংগ্রেসের লক্ষ্য হ'চ্ছে সর্ব্বহারাদের কল্যাণ। যাঁদের এখনও কিছু কিছু সম্পত্তি আছে—তাঁরা মনে করতে পারেন, কংগ্রেসে যোগ দিলে

যা আছে তাও হারাবো। কিন্তু এমন মনে করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়—কারণ এখনকার দিনে যাদের মূলধন খুব বেশী তারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হবে;—যাদের প্রাণ পুঁটিমাছের প্রাণ—সেই সব অল্প-মূলধন-ওয়ালা হতভাগ্য লোকেরা প্রতিযোগিতায় আপনাদের অস্তিত্ব হারাবে। বড় বড় ধনকুবেরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে তারা সর্ব্বহারাদের পর্য্যায়ে নেমে যেতে বাধ্য। এক্ষেত্রে তারা যদি শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে, চরমদৈন্যের হাত থেকে তারা নিস্তার পাবে—কারণ, কংগ্রেস যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে আসতে চায় সেখানে দৈন্য রূপান্তরিত হ'য়েছে প্রাচুর্য্যে আর সেই প্রাচুর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকলের অধিকার।

সর্ব্বহারাদেরও উচিত—যারা ঠিক তাদের দলে পড়ে না তাদের টেনে নিয়ে আসা স্বাধীনতা সংগ্রামে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না পেলে দৈন্য কোনোমতেই ঘুচবে না এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেতে হ'লে সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন আছে সর্ব্বাগ্রে। যাদের বলা হ'য়ে থাকে—পেটি বুর্জ্জোয়া তারাও তো রাষ্ট্রের জোয়ালের দ্বারা কম ভারাক্রান্ত নয়। সুতরাং তাদের দলে পাওয়া সহজ-সাধ্য ব্যাপার। তাই ঐক্যের মন্ত্রই হ'চ্ছে আজকের দিনে সব চেয়ে বড় মন্ত্র। এই মন্ত্রের আলোকে আমাদের মুক্তির পথ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠুক।